প্রোফেসর শঙ্কু

প্রোফেসর শঙ্কু ও ম্যাকাও

সত্যজিৎ রায়

৭ই জুন

বেশ কিছুদিন থেকেই আমার মন মেজাজ ভাল যাচ্ছিল না। আজ সকালে একটা আশ্চর্য ঘটনার ফলে আবার বেশ উৎফুল্ল বোধ করছি।

আগে মেজাজ খারাপ হবার কারণটা বলি। প্রোফেসর গজানন তরফদার বলে এক বৈজ্ঞানিক কিছুদিন আগে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। ভদ্রলোক যাবেন হাজারিবাগ। আমার নাম শুনে, আমার বইটই পড়ে এসেছিলেন আমার সঙ্গে আলাপ করতে এবং আমার ল্যাবরেটরিটা দেখতে। এর আগে অন্য কোনও বৈজ্ঞানিক যে আসেননি তা নয়। প্রায় সব দেশের বৈজ্ঞানিকেরাই ভারতবর্ষে এলে একবার আমার ল্যাবরেটরিটা ঘুরে দেখে যান। এক নরউইজীয় প্রাণীতত্ত্ববিদ তো প্রায় এক মাস কাটিয়ে গিয়েছিলেন আমার এখানে। কিন্তু এ লোকটি যেন একটু অন্যরকম। এঁর হাবভাব যেন কেমন কেমন। বড় বেশি খুঁটিনাটি প্রশ্ন এবং চাহনিতে এমন একটা চঞ্চল ও তীব্র ভাব, যেন দৃষ্টি দিয়েই আমার গবেষণার সব কিছু রহস্য আয়ত্ত করে ফেলবেন। মৌলিক গবেষণা নিয়ে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে একটু রেষারেষি থাকতে বাধ্য। আমি যে সব তথ্য বছরের পর বছর চিন্তা করে, অঙ্ক কষে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আবিষ্কার করেছি, তা কেউ এক প্রশ্নের জবাবেই সব জেনে ফেলবে এটা আশা করাটাই তো অন্যায়! অথচ ভদ্রলোকের যেন সে রকমই একটা মতলব। আমার চেহারা দেখে আমাকে বোধহয় নিরীহ গোবেচারা বলেই মনে হয়। নইলে সরাসরি এ সব প্রশ্ন করার সাহস হয় কী করে? আর প্রশ্ন করলেও তার জবাব পাবার আশা করে কী করে?

আমি আবার সে সময়টা একটা আশ্চর্য ওষুধ নিয়ে গবেষণা করছিলাম। সে ওষুধটা খেলে যে কোনও প্রাণী অদৃশ্য হয়ে যাবে। ওষুধে পুরো কাজ তখনও দিচ্ছিল না। যে গিনি পিগটার উপর পরীক্ষা করছিলাম, সেটা ওষুধ খাবার পর ঠিক সতেরো সেকেন্ডের জন্য একটা স্বচ্ছ ঝাপসা চেহারা নিচ্ছিল, সম্পূর্ণ অদৃশ্য হচ্ছিল না। কোনও উপাদানে একটু

গণ্ডগোল ছিল এবং সেই কারণেই আমার মনটা উদ্বিগ্ন ছিল। আর সেই সময়ে এলেন তরফদার মশাই।

তাঁর প্রশ্নবাণের ঠেলা সামলাতে সেদিন আমার রীতিমতো বেগ পেতে হয়েছিল। আর সে কী বেয়াড়া রকমের কৌতুহল! আর ওষুধপত্রের বোতল হাতে নিয়ে ছিপি খুলে শুকে না। দেখা অবধি যেন তাঁর শান্তি নেই। তবে একটা জিনিস টের পেয়ে বেশ মজা লাগছিল। আমার নিজের তৈরি ওষুধের প্রায় একটিও প্রোফেসর তরফদার চিনে উঠতে পারছিলেন না। অর্থাৎ সেগুলো কী কী জিনিস মিশিয়ে যে তৈরি হয়েছিল, তা তিনি মোটেই আন্দাজ করতে পারছিলেন না।

আমি অবিশ্যি আমার খাতপত্রগুলো তাঁকে ঘাঁটতে দিইনি। অর্থাৎ তার মধ্যেই অদৃশ্য হবার ওষুধের ফরমুলা এবং সেই সম্বন্ধে আমার গবেষণার যাবতীয় নোট ছিল। সেই খাতাটা আমি সব সময়ে চোখে চোখে রাখছিলাম। কথা বলতে বলতে হঠাৎ একটা রেজিস্টারি চিঠি এসে পড়াতে এবং আমার চাকর প্রহ্লাদ বাড়িতে না থাকাতে, আমাকে দু মিনিটের জন্য উঠে বাইরে যেতে হয়েছিল। ফিরে এসে দেখি তরফদার খাতাটা খুলে আমার লেখা গোগ্রাসে গিলছেন, তাঁর হাবভাবে একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনা।

আমি তাঁর হাত থেকে খাতাটা ছিনিয়ে নেবার অভদ্রতাটা করতে পারলাম না। কিন্তু তার পরিবর্তে বাধ্য হয়েই একটা মিথ্যের আশ্রয় আমাকে নিতে হল। বললাম, দেখুন, আমি এই মাত্র একটা চিঠি পেয়েছি, তাতে একটা বড় দুঃসংবাদ রয়েছে। আপনি যদি কিছু মনে না। করেন—আজ আর আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারছি না।

এর পরে আরও দুদিন এসেছিলেন প্রোফেসর তরফদার কিন্তু আমার ল্যাবরেটরিতে তাঁর প্রবেশ করা হয়নি। কারণ তিনি এসেছেন জেনেই আমি ল্যাবরেটরিতে তালা লাগিয়ে তাঁকে বৈঠকখানায় বসিয়েছি। ফলে দুবারই ভদ্রলোক চা খেয়ে পাঁচমিনিট উশখুশ করে আজেবাজে বকে বিদায় গ্রহণ করেছেন।

তারপর কবে যে তিনি হাজারিবাগ ফিরে গেছেন জানি না। এই কদিন আগে বুধবার তাঁর কাছ থেকে একখানা চিঠি পেয়েছি। এ চিঠির মর্ম আমার মোটেই ভাল লাগেনি। তরফদার আমার গবেষণা সম্পর্কে একটা চাপা বিদ্রুপের সুরে লিখছেন যে তিনি আমার কাজে মাোটেই ইমপ্রেসড় হননি এবং তিনি নিজেই একটি অদৃশ্য হবার আশ্চর্য উপায় আবিষ্কার করতে চলেছেন, আমার আবিষ্কারের চেয়ে তার মূল্য নাকি অনেক বেশি। অল্পদিনের মধ্যেই নাকি তিনি এই আবিষ্কারের কথা প্রচার করে আমাকে টেক্কা দেবেন।

আমি চিঠিটা পড়ে প্রথমে হেসে উড়িয়ে দিচ্ছিলাম। তারপর হঠাৎ একটা খটকা লাগিল। যে দু মিনিট তরফদার আমার খাতা খুলে দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন, তার মধ্যে তিনি কি আমার ফরমুলা সব কণ্ঠস্থ করে ফেলেছেন নাকি? এবং সেটার ভিত্তিতেই কি তিনি নিজে কাজ করে খোদার উপর খোদকারি করতে চলেছেন? না, অসম্ভব। তরফদারের এমন ক্ষমতা আছে বলে আমার আন্দীে বিশ্বাস হয় না। বরং তাঁকে আমার মোটামুটি সাধারণ স্তরের বৈজ্ঞানিক বলেই মনে হয়েছিল। তবুও চিঠিটা পড়ে আমার মেজাজটা কেমন জানি তেতো হয়ে গিয়েছিল।

এমন সময়ে ঘটল এক আশ্চর্য ঘটনা এবং সেটা ঘটেছে আজই সকলে।

ভোর সাড়ে ছাঁটায় উস্ত্রীর ধারে বেড়িয়ে এসে অভ্যাসমতো আমার বাগানের ফুলগাছগুলো দেখতে গিয়েছি। এমন সময়ে পুব দিকের দেয়ালের ধারে গোলঞ্চগাছটার দিকে চাইতেই দেখি গাছটার একটা ডালে চোখ-ঝলসানো রঙের খেলা।

কাছে গিয়ে দেখি এক অতিকায় আশ্চর্য সুন্দর ম্যাকাও (Macaw বা Macao) পাখি গাছটার একটা ডালে বসে আমার দিকে চেয়ে আছে। ম্যাকাও কাকাতুয়া জাতীয় পাখি, কিন্তু আয়তনে কাকাতুয়ার চেয়ে প্রায় চারগুণ বড়। এর আদি বাসস্থান দক্ষিণ আমেরিকা। এত রঙের বাহার। পৃথিবীতে আর কোনও পাখির আছে বলে মনে হয় না। দেখলে মনে হয় প্রকৃতি যেন রামধনুর সাতটি রং নিয়ে খেলা করতে করতে খেয়ালবশে পাখিটির গায়ে তুলির আচড় কেটেছেন। এ পাখি ঘরে রাখলে ঘর আলো হয়ে যাবে।

কিন্তু আমার বাগানে ও এল কী করে?

আর গাছ থেকে উড়ে এসে আমার কাঁধে বসবে কেন এ পাখি?

যাই হোক ইনি আমার পোষা না হলেও, আমার কাছে থাকতে এর কোনও আপত্তি হবে বলে মনে হয় না।

আমি ম্যাকাওটিকে কাঁধে নিয়ে বাড়ির ভিতর চলে এলাম। তারপর আমার ল্যাবরেটরিতেই সেটাকে রাখবার ব্যবস্থা করলাম। ল্যাবরেটরিতেই আমার অধিকাংশ সময় কাটে। পাখিটাকে চোখে চোখে রাখার সুবিধা হবে। একবার মনে হয়েছিল যে আমার ওষুধপত্রের উৎকট গন্ধে হয়তো এর আপত্তি হবে—কিন্তু সে টু শব্দটি করল না।

আমার বেড়াল নিউটন দু-একবার ফ্যাস ফোঁস করেছিল। কিন্তু পাখির দিক থেকে কোনও রকম বিরক্তি বা শত্রুতার লক্ষণ না দেখে সে চুপ করে গেল। কিছুদিন পরে হয়তো দেখব পরস্পরের মধ্যে বেশ বন্ধুত্বই হয়েছে।

সকালে দুটো ক্রিম ক্র্যাকার বিস্কুট খেয়েছে পাখিটা। তারপর তার উপযুক্ত খাদ্যের ব্যবস্থা করেছি। প্রহাদ প্রথমে যেন হকচাকিয়ে গিয়েছিল তারপর সেও পাখিটাকে মেনে নিয়েছে। আমার বিশ্বাস কয়েক দিনের ভিতর প্রহ্লাদও পাখিটাকে আমার মতন ভালবেসে ফেলবে। আজ ল্যাবরেটরিতে কাজ করতে করতে অনেকবার পাখিটার দিকে চোখ পড়ে গেছে। প্রতিবারই দেখেছি সে একদৃষ্টি আমার দিকে চেয়ে আছে। কার পাখি, কোথেকে এল কে জানে!

১৯শে জুন

আজ এক অদ্ভুত ঘটনা। গিনিপিগের খাঁচা থেকে টেবিলে এনে ওষুধের বোতলটি হাত থেকে নামিয়ে রাখছি। এমন সময় হেঁড়ে কর্কশ গলায় প্রশ্ন এল—কী করচ?

আমি চমকে এদিক ওদিক চেয়ে ম্যাকাওটার দিকে চাইতে সেটার ঠোঁটটা নড়ে উঠল।

কী কর্‌রচ? কী কর্‌রচ?

আমি তো অবাক। এ যে কথা বলে।

শুধু কথা নয়। এমন স্পষ্ট কথা আমি পাখির মুখে কখনই শুনিনি।

আমি কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে ম্যাকাওটার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

তারপর পাখিটার মুখ থেকে একটা শব্দ বেরোল যেটা খ্যাঁক খ্যাঁক হাসি ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।

আমার হাতের বোতলটা হাতেই রয়ে গেল।

তারপর দেখি ম্যাকাওটার ঠোঁট আবার নড়ছে-ওটা কী? ওটা কী? ওটা কী?

এবার আমার হাসির পালা। ম্যাকাওটা জানতে চায় বোতলে কী আছে!

আমার হাসি শুনে ম্যাকাও মশাই যেন একটু গভীর হয়ে গেলেন। তারপর গলার স্বরটিকে আরেকটু কর্কশ করে কথা এল–হাসির কী? হাসির কী? হাসির কী?

না, এঁকে সিরিয়াসলি না নিলে বোধহয় ইনি অসন্তুষ্ট হবেন। আমি গলাটা খাঁকরে নিয়ে বললাম-এতে একটা ওষুধ আছে। সেটা যে খাবে সে অদৃশ্য হয়ে যাবে।

বটে? বটে?

হ্যাঁ। এখন খেলে ঘণ্টা পাঁচেকের জন্য অদৃশ্য। অনুপানে তফাত করলে সময় বাড়ানো কমানো যেতে পারে।

www.bengaliebook.com

ম্যাকাওটা কিছুক্ষণ চুপ করে একটা শব্দ করল, সেটা ঠিক মানুষের গভীর গলায় হুঁ বলার মতো শোনাল।

তারপর আবার প্রশ্ন এল—কী ওষুধ? কী ওষুধ?

আমি কোনওমতে হাসি চেপে বললাম..এখনও নাম দিইনি। কী কী মিশিয়ে তৈরি সেটা বলতে পারি। এক্সট্রাক্ট অফ গরগনাসস, প্যারানইয়াম পোটেনটেট, সোডিয়াম বাইকারবোনেট, বাবুইয়ের ডিম, গাঁদালের রস আর টিনচার আয়োডিন।

ম্যাকাও এবার চুপ। দেখলাম সে একদৃষ্টে ল্যাবরেটরির মেঝের দিকে চেয়ে আছে। আমি এবার বললাম, তুমি এমন আশ্চর্য কথা বলতে শিখলে কী করে?

ম্যাকাও নির্বাক।

আমি আবার বললাম, কী করে শিখলে?

একবার মনে হল ম্যাকাওর ঠোঁটটা নড়ে উঠল। কিন্তু কথা বেরোল না। পড়ে পাওয়া এই বিচিত্র পাখি যে আবার কথা বলতে পারবে এ তো ভাবাই যায়নি। এটা একেবারে ফাউ।

২২শে জুন

আজ এই আধঘণ্টা আগে, রাতের খাওয়া শেষ করে ল্যাবরেটরির দিকে যাচ্ছি। ঘরটায় তালা দেব বলে এমন সময়ে দরজার মুখটাতে আসতেই একটা বিড়বিড় করে কথা বলার শব্দ পেলাম। এটা ম্যাকাওটারই কথা কিন্তু আস্তে আস্তে চাপা গলায় কথা বলছে সে। আমি পা টিপে টিপে দরজার কাছে গিয়ে কান পাততেই কথাটা স্পষ্ট হয়ে এল।

এক্সট্রাক্ট অফ গরগনাসস, প্যারানইয়াম পেটেনটট, সোডিয়াম বাইকার্বনেট, বাবুইয়ের ডিম, গাঁদালের রস, টিনচার আয়োডিন—, আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দশবার এই নামের আবৃত্তি শুনে তারপর গলা খাঁকরিয়ে ল্যাবরেটরিতে ঢুকে বললাম, গুড নাইট!

ম্যাকাও তার আবৃত্তি থামিয়ে কয়েক সেকেন্ড আমার দিকে চেয়ে থেকে বলল, বুয়েনা নোচে। অর্থাৎ গুড নাইটের স্প্যানিশ অনুবাদ।

এর আদি বাসস্থান যে সত্যিই দক্ষিণ আমেরিকা সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ রইল না। ল্যাবরেটরিতে যখন তালা লাগাচ্ছি তখন শুনতে পেলাম আবার আবৃত্তি শুরু হয়েছে।

আমি এই অত্যাশ্চর্য পাখির বাকশক্তি আর স্মরণশক্তির কথা ভাবতে ভাবতে ওপরে চলে এলাম।

২৪শে জুন

আজ বড় দুঃখের দিন। আমার প্রিয় ম্যাকাও পাখিটি উধাও হয়েছেন। উধাও মানে অদৃশ্য নয়। অর্থাৎ আমি তার উপর কোনও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করিনি। সে সত্যি সত্যিই কোথায় যেন চলে গেছে। এটা তার হঠাৎ আবিভবের মতোই রহস্যজনক।

সকালে ল্যাবরেটরির দরজা খুলে দেখি উত্তর দিকের জানালার পাশে রাখা লোহার দাঁড়টা খালি। পাখিটার উপর আমার এতই বিশ্বাস ছিল যে তাকে চেন দিয়ে বেঁধেও রাখিনি।

আমার স্পষ্ট মনে আছে যে জানালাটায় আমি নিজের হাতে ছিটিকিনি লাগিয়েছিলাম। এখন দেখি জানালাটা খোলা। গরাদের ফাঁক দিয়ে কসরত করে বেরিয়ে যাওয়া পাখিটার পক্ষে অসম্ভব নয়। কিন্তু ছিটিকিনি খুলল কে? তা হলে কি ম্যাকাও-বাবাজি তাঁর বিরাট ঠোঁট দিয়ে নিজেই এ কর্ম করেছেন? কিন্তু এত পোষা পাখি, খাদ্য বা যত্নেরও তো কোনও অভাব ছিল না-সে। পাখি পালাবে কেন?

www.bengaliebook.com

আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল! একটা টকটকে লাল পালক পড়েছিল জানালাটার কাছে মেঝেতে। আমি সেটাকে যত্ন করে তুলে রেখে দিলাম। তার পরে ল্যাবরেটরি বন্ধ করে দোতলায় এসে চুপ করে শোবার ঘরের জানালার ধারে আমার বেতের চেয়ারটায় বসে রইলাম।

বিকেলে আমার প্রতিবেশী অবিনাশবাবু এসেছিলেন। চা খেতে খেতে এমন বকবক শুরু করলেন যে একবার ইচ্ছে হল আর এক পেয়ালা চা অফার করে তার সঙ্গে একটু নতুন ওষুধ মিশিয়ে দিয়ে তাঁকে একটু শিক্ষা দিই। কিন্তু সেটার আর প্রয়োজন হল না।

ভদ্রলোক যেন আমার মেজাজের কথা অনুমান করে নিজেই বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। শুধু পাখির রহস্যের সমাধান হল না বলে নয় পাখিটার উপর সত্যিই মায়া পড়েছিল—তাই আমার মনের এই অবস্থা।

কাল থেকে আবার ওষুধটা নিয়ে পড়তে হবে। আমি জানি একমাত্র কাজই আমার এই বন্ধু-বিচ্ছেদের দুঃখ ভুলতে সাহায্য করবে।

২১শে জুলাই

আজকের ঘটনা যেমনই রোমাঞ্চকর তেমনই অবিশ্বাস্য। কজন বৈজ্ঞানিকের জীবনে এমন সব চিত্তাকর্ষক ঘটনা ঘটেছে জানতে ইচ্ছা করে।

কদিন থেকেই বৃষ্টি হবার ফলে একটু ঠাণ্ডা পড়েছিল। উশ্রীর ধারে সকালটায় বেশ আরাম বোধ করেছিলাম, তাই বোধ হয় বেড়ানোর মাত্রাটো আজ একটু বেশি হয়ে গিয়েছিল। বাড়ি যখন ফিরছি তখন প্রায় সাতটা বাজে। প্রহ্লাদের তখনও বাজার থেকে ফেরার কথা নয়। তাই বাড়ির কাছাকাছি এসে সদর দরজাটা খোলা দেখে মনে কেমন জানি খটকা লাগল।

তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়েই বুঝতে পারলাম যে তালাটা স্বাভাবিক ভাবে খোলা হয়নি। কোনও বৈজ্ঞানিক উপায়ে উত্তাপের সাহায্যে গলিয়ে সেটাকে খোলা হয়েছে।

আমার বুকের ভেতরটা ধড়াস করে উঠল।

দৌড়ে বাড়ির ভিতর গিয়ে প্রথমেই চোখে পড়ল নিউটনকে। সে বৈঠকখানার এক কোণে শজারুর মতো লোম খাড়া করে দাঁড়িয়ে আছে।

নিউটনের এমন সন্ত্রস্ত ভাব আমি আর কোনওদিন দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

আবার একটা শব্দ শুনলাম আমার ল্যাবরেটরির দিক থেকে। কে যেন আমার জিনিসপত্র নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছে।

আমি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গিয়ে ল্যাবরেটরিতে ঢুকেই এক আশ্চর্য দৃশ্য দেখতে পেলাম। আমার ফ্লাস্ক, রিটর্ট, টেস্ট টিউব ইত্যাদি গবেষণার যাবতীয় সরঞ্জাম সব চারদিকে ছড়ানো, আলমারি খোলা, বইপত্তর সব ধুলোয় লুটোপুটি, ওষুধের বোতল খোলা অবস্থায় টেবিলে পড়ে তার থেকে ওষুধ বেরিয়ে টেবিলের গা বেয়ে চুইয়ে টপটপ করে মেঝেতে পড়ছে।

পরমুহূর্তেই আর একটা দৃশ্য চোখে পড়ল। আমার এক গোছা নোটস-এর খাতা শূন্যে এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করতে করতে হঠাৎ জানালার দিকে উড়ে গেল!

জানালার শিকগুলোকে দেখি গলিয়ে খুলে ফেলা হয়েছে। আমি কয়েক সেকেন্ড হতভম্ব থেকে তারপর সংবিৎ ফিরে পেয়ে একলাফে আমার জিনিসপত্র ডিঙিয়ে জানালার কাছে গিয়ে আমার খাতাগুলির উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম।

তারপর এক বিচিত্র যুদ্ধ। কোনও এক অদৃশ্য ডাকাতের সঙ্গে চলল আমার ধস্তাধস্তি! লোকটা তেমন জোয়ান নয়। সে অদৃশ্য হওয়াতে তার সঙ্গে যুঝতে আমার বেশ বেগ পেতে হল। কিন্তু আমিও ছড়বার পাত্র নই। ওই খাতাগুলিই আমার প্রাণ। ওতে রয়েছে

www.bengaliebook.com

আমার চল্লিশ বছরের বৈজ্ঞানিক জীবনের সমস্ত ফলাফল। মরিয়া হয়ে শরীরের সমস্ত বল প্রয়োগ করে বেপরোয়া কিল ঘুঁসি লাথি মেরে খাতাগুলো উদ্ধার করবার পরমুহূর্তেই লোকটা জানালা টপকিয়ে বাইরের বাগানে গিয়ে পড়ল। আমি কোনওমতে জানালার কাছে গিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখি বাগানের ঘাসের উপর দিয়ে একটা পায়ের ছাপ পাঁচিলের দিকে এগিয়ে চলেছে।

তারপর কানে এল এক পরিচিত পাখির কর্কশ। কণ্ঠস্বর ও ডানার ঝটপটানি।

পূর্বদিকের পাঁচিল বেয়ে উঠে তখন লোকটা পালাবার চেষ্টা করছে। কারণ পাঁচিলের গায়ের ফাটল থেকে যে অশ্বত্থের চারা বেরিয়েছিল সেটা চোখের সামনে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

আর সেই সময়ে শুনলাম এক মানুষের গলার আর্তনাদ।

এ গলা আমার চেনা গলা।

এ গলা প্রোফেসর গজানন তরফদারের।

অদৃশ্য ম্যাকাও অদৃশ্য প্রোফেসরকে আক্রমণ করেছে।

পাঁচিলের গা বেয়ে রক্তের ধারা নেমে আসছে বাগানের ঘাসের দিকে।

তারপর শব্দ হল-ধুপ।

প্রোফেসর তরফদার পাঁচিল টপকিয়ে ওপাশের জমিতে পড়েছেন।

তারপর সব শেষে পলায়মান পায়ের শবদ।

আমি জানালার পাশের চেয়ারটায় ক্লান্তভাবে বসে পড়লাম।

বুকে হাত দিয়ে বুঝলাম হৃৎস্পন্দন রীতিমতো বেড়ে গেছে।

www.bengaliebook.com

এই বারে একটা ঠিং শব্দ শুনে মাথা তুলে দেখি ম্যাকাও-এর দাঁড়টা ঈষৎ কম্পমান।

বাবাজি ফিরে এসেছেন!

বুয়েনা দিয়া! বুয়েনা দিয়া!

আমি ইংরাজিতে উত্তর দিলাম, গুড মর্নিং! ব্যাপার কী?

ফিরেচি! ফিরেচি!

সে তো দেখতেই পাচ্ছি, থুড়ি, শুনতে পাচ্ছি!

চোর, চোর! জোচোর, জোচ্চোর, জোচ্চোর

কে?

তর্‌রফদার্‌র্‌!

তাকে তুমি চিনলে কী ভাবে?

ম্যাকাও যা বলল তাতে এক আশ্চর্য কাহিনী প্রকাশ পেল।

তরফদার গিয়েছিলেন ব্রেজিলে বছরখানেক আগে। সেখানে এক সাকার্স থেকে এই পাখিটি তিনি নিয়ে আসেন, তাও চুরি করে। সতেরোটি বিদেশি ভাষা জানা, অলৌকিক স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন এই ম্যাকাওটিকে নিয়ে সেই সার্কাসে খেলা দেখাত এক বাজিকর বা কাজেই তার বুদ্ধি ও বাকশক্তির ব্যাপারে তরফদারের কোনও কৃতিত্ব নেই।

যদিও ম্যাকাও বাংলা শিখেছে তরফদারের কাছেই।

তরফদার পাখিটিকে আমার গোলঞ্চগাছের ডালে রেখে যান যাতে সে আমার সঙ্গে থেকে, আমার ফরমুলা সংগ্রহ করে, তারপর তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে সেই ফরমুলা বলে দেয়।

অদৃশ্য হবার ওষুধের উপাদানগুলি ম্যাকাওটির কাছ থেকে জেনে নিয়ে তারপর তাই দিয়ে দশ ঘণ্টা অদৃশ্য থাকবার মতো একটা মিক্সচার তৈরি করে সেটা পান করে তরফদার নিজেকে অদৃশ্য করে ফেলেন।

সেই সময় ম্যাকাওটি তরফদারের হাবভাব লক্ষ করে বুঝতে পারে যে এবার তিনি তাঁর পোষা পাখিটিকে হত্যা করবার ফন্দি করেছেন। কারণ তাঁর হয়তো ভয় হয়েছে যে পাখিটি ভবিষ্যতে অন্য কোনও বৈজ্ঞানিকের কাছে ফরমুলাটি ফাঁস করে দিতে পারে। অদৃশ্য তরফদারের আলমারি খুলে যখন তার ভেতর থেকে বন্দুক এবং টোটা বেরিয়ে আসে। সেই সময় ম্যাকাওটি আত্মরক্ষার আর কোনও উপায় না দেখে ঠোঁটের এক কামড়ে ওষুধের বোতলটি খুলে ফেলে ঢাক ঢক করে খানিকটা ওষুধ গিলে ফেলে অদৃশ্য হয়ে যায়।

তরফদার এদিক ওদিক গুলি চালিয়ে ঘরের দেয়াল ক্ষতবিক্ষত করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারেননি। তারপর সেই অদৃশ্য অবস্থাতেই গাড়ি চালিয়ে তরফদার হাজারিবাগ থেকে গিরিডি চলে আসেন। গাড়ির পিছনের সিটেই যে ম্যাকাওটি বসেছিল। তিনি টেরই পাননি।

গিরিডি পৌঁছে গাড়িটাকে একটু দূরে রেখে দিয়ে শেষ রাত্তির থেকে আমার বাড়ির কাছেই একটা ঝোপের আড়ালে ওত পেতে বসে থাকা এবং আমি ও প্রহ্লাদ বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলে ডাকাতির তোড়জোড়!

আমি জিজ্ঞেস করলাম—ডাকাতির সময়ে তুমি কোথায় ছিলে?

বাইরে, বাইরে। তোমার গাছে।

www.bengaliebook.com

তারপর?

ও বেরোলেই ধরলাম। চোর চোর, জোচোর জোচোর।

আর আমি?

ভাল, ভাল। এখানেই থাকব।

বেশ তো, থাকো না। আর কোনও বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে দোস্তি নেই তো? আমার ফরমুলা অন্যের কাছে পৌঁছবে না তো?

ম্যাকাও আবার সেইভাবে অট্টহাস্য করল।

জিজ্ঞেস করলাম-ওষুধ কটায় খেয়েছ?

রাত দশটা।

বটে এখন তো আটটা বাজে। দশ ঘণ্টা তো হয়ে এল।

তা তো বটেই! হ্যাঃ, হ্যাঃ, হ্যাঃ, হ্যাঃ!

সেই হাসির সঙ্গে সঙ্গেই দেখলাম আমার ঘরটা আস্তে আস্তে আলো হয়ে উঠল। সূর্যের আলো নয়, ম্যাকাওর বহুবিচিত্র পালকের চোখ ঝলসানো রং-এর আলোয় আমার ল্যাবরেটরির চেহারা ফিরে গেল।

আমি আমার খাতাগুলো ঝাড়তে ঝাড়তে চেয়ার থেকে উঠে পড়ে ম্যাকাওটার মাথায় হাত বুলিয়ে বললুম থ্যাঙ্ক ইউ!

ম্যাকাও বলল, গ্রাসিয়া, গ্রাসিয়া!

সন্দেশ। শারদীয়া ১৩৭১